سورة الجمعة

সূরা জুমু‘আ

মদীনায় অবতীর্ণ, ১১ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ
الْحَكِيْمِ ۝١ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ
وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ۝٢ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٣ ذٰلِكَ
فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝٤ مَثَلُ
الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۗ
بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ۝٥ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ
مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٦ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ
اَبَدًا ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝٧ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ
الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٨ ع

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে, যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে। (২) তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য

থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। (৩) এই রসূল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরও লোকদের জন্য, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪) এটা আল্লাহ্‌র কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ্ মহাকৃপাশীল। (৫) যাদেরকে তওরাত দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে। যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (৬) বলুন---হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু---অন্য কোন মানব নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৭) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (৮) বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন কর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন সেই সব কর্ম, যা তোমরা করতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে (মুখে অথবা অবস্থার মাধ্যমে) যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে এবং যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে। তিনিই (আরবের) নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই (সম্প্রদায়ের) মধ্য থেকে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে (ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুচরিত্র থেকে) পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন (সব ধর্মীয় জরুরী জ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত)। ইতিপূর্বে (অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে) তারা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল। (অর্থাৎ শিরক ও কুফরে লিপ্ত ছিল। মানে অধিকাংশ লোক লিপ্ত ছিল। কেননা, মূর্খতা যুগেও কিছুসংখ্যক একত্ববাদী বিদ্যমান ছিল)। এই রসূল অন্য আরও লোকদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন, যারা (মুসলমান হয়ে) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি (ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে অথবা তারা এখনও জন্মগ্রহণই করেনি। এতে কিয়ামত পর্যন্ত আরব-অনারব সব লোক অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। মুসলমান সব ইসলামের সম্পর্কে এক ও অভিন্ন, তাই তাদেরকে منهم বলা হয়েছে।---(খাযেন) তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (তাই এমন নবী প্রেরণ করেছেন)। এটা (অর্থাৎ রসূলের মাধ্যমে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি পেয়ে কিতাব ও হিদায়তের দিকে আসা) আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। আল্লাহ্ মহাকৃপাশীল। (সবাইকে দিলেও দিতে পারেন, কিন্তু তিনি স্বীয় প্রজ্ঞাবলে যাকে ইচ্ছা দেন এবং বঞ্চিত রাখেন। উপরে নিরক্ষরদের মু'মিন হওয়া এবং ইহুদী আলিমদের মু'মিন না হওয়া থেকে এ কথা সুস্পষ্ট। অতঃপর রিসালত অমান্যকারীদের নিন্দায় বলা হচ্ছে ঃ) যাদেরকে তওরাত মেনে চলতে বলা

হয়েছিল, অতঃপর তারা তা মেনে চলেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে (কিন্তু পুস্তকের উপকার পায় না। তেমনিভাবে জ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য ও উপকার হচ্ছে তদনুযায়ী কাজ করা। এটা না হলে জ্ঞানার্জন পণ্ডশ্রম মাত্র। জন্তুদের মধ্যে গাধা প্রসিদ্ধ বেওকুফ। তাই বিশেষভাবে একে উল্লেখ করে অধিক ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে)। যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা বলে তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট (যেমন এই ইহুদীরা)। আল্লাহ্ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।] কারণ তারা জেনে-বুঝে হঠকারিতা করে। হঠকারিতা ত্যাগ করলেই তাদের পথপ্রদর্শন হবে। তওরাত মেনে চলার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী। সুতরাং বিশ্বাস স্থাপন না করা তওরাত অমান্য করার নামান্তর। যদি তারা বলে যে, তারা এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্‌র প্রিয়, তবে] আপনি বলুন ঃ হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু---অন্য মানুষ নয়, তবে (এর সত্যায়নের জন্য) তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা (এই দাবীতে) সত্যবাদী হও। (আমি সাথে সাথে এ কথাও বলে দিচ্ছি যে) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে (অর্থাৎ শাস্তির ভয়ে) কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (বিচারের দিন আসলে অপরাধের বিবরণ শুনিয়ে শাস্তির আদেশ দেবেন। শাস্তির এই প্রতিশ্রুতিকে জোরদার করার জন্য আপনি একথাও) বলুন ঃ তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন কর, (এবং বন্ধুত্ব দাবী করা সত্ত্বেও শাস্তির ভয়ে যা কামনা কর না) সেই মৃত্যু (একদিন) অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে। অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ্‌র কাছে নীত হবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম জানিয়ে দেবেন (এবং শাস্তি দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ —কোরআন পাকে যেসব সূরা يُسَبِّحُ ও سَبَّحَ শব্দ দ্বারা শুরু হয়, সেগুলোকে 'মুসাব্বাহাত' বলা হয়। এসব সূরায় নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর জন্য আল্লাহ্‌র পবিত্রতা পাঠ সপ্রমাণ করা হয়েছে। অবস্থার মাধ্যমে এই পবিত্রতা পাঠ সবারই বোধগম্য। কারণ, সৃষ্ট জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তার প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও অপার শক্তি-সামর্থ্যের সাক্ষ্যদাতা। এটাই তার পবিত্রতা পাঠ। নির্ভুল সত্য এই যে, প্রত্যেক বস্তু তার নিজস্ব ভঙ্গিতে আক্ষরিক অর্থেও পবিত্রতা পাঠ করে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জড় ও অজড় পদার্থের মধ্যে তার সাধ্যানুযায়ী চেতনা ও অনুভূতি রেখেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতির অপরিহার্য দাবী হচ্ছে পবিত্রতা পাঠ। কিন্তু এসব বস্তুর পবিত্রতা পাঠ মানুষ শ্রবণ করে না। তাই কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ —অধিকাংশ

সূরার শুরুতে অতীত পদবাচ্যে سَبَّحَ বলা হয়েছে। কেবল সূরা জুমু'আ ও সূরা তাগা-বুনে ভবিষ্যৎ পদবাচ্যে يُسَبِّحُ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ভাষাগত অলংকার এই যে, অতীত পদবাচ্যে নিশ্চয়তা বোঝায়। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই ব্যবহৃত হয়েছে। ভবিষ্যৎ পদবাচ্য সদাসর্বদা হওয়া বোঝায়। এই অর্থ বোঝাবার জন্য দুই জায়গায় এই পদ ব্যবহার করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا—اُمِّيّٖن শব্দটি اُمِّى এর বহু-বচন। এর অর্থ নিরক্ষর। আরবরা এই পদবীতে সুবিদিত। কারণ, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। লেখাপড়া জানা লোক খুব কম ছিল। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তি প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে আরবদের জন্য এই পদবী অবলম্বন করা হয়েছে এবং এ কথাও বলা হয়েছে যে, প্রেরিত রসূলও তাদেরই একজন অর্থাৎ নিরক্ষর। কাজেই এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, গোটা জাতি নিরক্ষর এবং তাদের কাছে যে রসূল প্রেরিত হয়েছেন, তিনিও নিরক্ষর। অথচ যেসব কর্তব্য এই রসূলকে সোপর্দ করা হয়েছে, সেগুলো সবই এমন শিক্ষামূলক ও সংস্কারমূলক যে, কোন নিরক্ষর ব্যক্তি এগুলো শিক্ষা দিতে পারে না এবং কোন নিরক্ষর জাতি এগুলো শিখার যোগ্য নয়।

একে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তিবলে রসূলে করীম (সা)-এর অলৌকিক ক্ষমতাই আখ্যা দেওয়া যায় যে, তিনি যখন শিক্ষা ও সংস্কারের কাজ শুরু করেন, তখন এই নিরক্ষরদের মধ্যেই এমন সুপণ্ডিত ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটল, যাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও কুশলতা এবং উৎকৃষ্ট কর্মপ্রতিভা সারা বিশ্বের স্বীকৃতি ও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পয়গম্বর প্রেরণের তিন উদ্দেশ্য ঃ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ---এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ এক. কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত, দুই. উম্মতকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা, তিন. কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেওয়া।

এই তিনটি বিষয়ই উম্মতের জন্য যেমন আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত, তেমনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যেরও অন্তর্ভুক্ত।

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ— تِلَاوَت-এর আসল অর্থ অনুসরণ করা। পরিভাষায় শব্দটি আল্লাহ্র কালাম পাঠ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। اٰيٰت বলে কোরআনের আয়াত বোঝানো হয়েছে। عَلَيْهِمْ শব্দে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করার এক উদ্দেশ্য এই যে, তিনি মানুষকে কোরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য يُزَكِّيهِمْ — এটা تَزْكِيَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ পবিত্র করা। অভ্যন্তরীণ দোষ থেকে পবিত্র করার অর্থে অধিকতর ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ কুফর, শিরক ও কুচরিত্রতা থেকে পবিত্র করা। কোন সময় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার পবিত্রতার জন্যও ব্যবহৃত হয়। এখানে এই ব্যাপক অর্থই উদ্দেশ্য।

তৃতীয় উদ্দেশ্য يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ---'কিতাব' বলে কোরআন পাক এবং 'হিকমত' বলে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত উক্তিগত ও কর্মগত শিক্ষাসমূহ বোঝানো হয়েছে। তাই অনেক তফসীরকার এখানে হিকমতের তফসীর করেছেন সুন্নাহ্।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, তিলাওয়াতের পরই কিতাব শিক্ষাদানের কথা এবং এরপর পবিত্র করার কথা উল্লেখ করা বাহ্যত সঙ্গত ছিল। কেননা, এই বিষয়-ত্রয়ের স্বাভাবিক ক্রম তাই। প্রথমে তিলাওয়াত অর্থাৎ ভাষা ও অর্থ সত্তার শিক্ষা দেওয়া হয়। এর পরিণতিতে কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের পালা আসে। কোরআন পাকে এই আয়াত কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ জায়গায় স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করে তিলাওয়াত ও শিক্ষাদানের মাঝখানে তাযকিয়া তথা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

রূহুল-মা'আনীতে এর জওয়াবে বলা হয়েছে, যদি স্বাভাবিক ক্রম অবলম্বন করা হত, তবে এই বিষয়ত্রয় মিলে এক-একটি স্বতন্ত্র বিষয় হত, যেমন চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্রে কয়েক প্রকার ঔষধের সমষ্টিকে একই ঔষধ বলা হয়ে থাকে। এখানেও এই সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এই বিষয়ত্রয়ে আলাদাভাবে স্বতন্ত্র নিয়ামত এবং পৃথক পৃথকভাবে রিসালতের কর্তব্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। ক্রম পরিবর্তন করার ফলে এদিকে ইঙ্গিত হতে পারে।

সূরা বাকারায় এই আয়াতের বিস্তারিত তফসীর অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়সহ বর্ণিত হয়েছে।

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ—آخَرِين

এর শাব্দিক অর্থ অন্য লোক। لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ -এর অর্থ যারা এখন পর্যন্ত তাদের অর্থাৎ নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে বোঝানো হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে প্রথম কাতারের মু'মিন অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের সাথে সংযুক্ত মনে করা হবে। এটা নিঃসন্দেহে পরবর্তী মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ---(রূহুল-মা'আনী)

কেউ কেউ آخَرِين শব্দটিকে أُمِّيِّين -এর উপর عطف করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে নিরক্ষরদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনও নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করার বিষয়টি বোধগম্য কিন্তু যারা এখনও দুনিয়াতে আগমনই

করেনি, তাদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করার মানে কি? বয়ানুল-কোরআনে বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রেরণ করার অর্থ তাদের জন্য প্রেরণ করা فى শব্দটি আরবী ভাষায় এই অর্থেও আসে।

কেউ কেউ آخرين শব্দের عطف মেনেছেন يعلمهم -এর সর্বনামের উপর। এর অর্থ এই হবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) শিক্ষা দেন নিরক্ষরদেরকে এবং তাদেরকে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।---(মাযহারী)

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় সূরা জুমু'আ অবতীর্ণ হয়। তিনি আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনান। তিনি وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ পাঠ করলে আমরা আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা কারা? তিনি নিরুত্তর রইলেন। দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার প্রশ্ন করার পর তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট সালমান ফারসী (রা)-র গায়ে হাত রাখলেন এবং বললেন: যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের সমান উচ্চতায়ও থাকে, তবে তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক সেখান থেকেও ঈমানকে নিয়ে আসবে।---(মাযহারী)

এই রেওয়ায়েতেও পারস্যবাসীদের কোন বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না বরং এতটুকু বোঝা যায় যে, তারাও آخرين অর্থাৎ অন্য লোকদের সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীসে অনারবদের যথেষ্ট ফযীলত ব্যক্ত হয়েছে।---(মাযহারী)

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا

اسفار— শব্দটি سفر-এর বহুবচন। এর অর্থ বড় পুস্তক। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নিরক্ষর লোকদের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাব ও নবুয়ত এবং তাঁকে প্রেরণ করার তিনটি উদ্দেশ্য যে ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, তওরাতেও তা প্রায় একই ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখামাত্রই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইহুদীদের উচিত ছিল। কিন্তু পার্থিব জাঁকজমক ও ধনৈশ্বর্য তাদেরকে তওরাত থেকে বিমুখ করে রেখেছে। ফলে তারা তওরাতের পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তওরাতের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মূর্খ ও অনভিজ্ঞের পর্যায়ে চলে এসেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, যাদেরকে তওরাতের বাহক করা হয়েছিল অর্থাৎ অযাচিতভাবে আল্লা-হ্‌র এই নিয়ামত দান করা হয়েছিল, তারা যথাযথভাবে একে বহন করেনি অর্থাৎ তারা তওরাতের নির্দেশাবলীর পরোয়া করেনি। ফলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গর্দভ, যার পিঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃহদাকার গ্রন্থ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই গর্দভ সেই বোঝা বহন তো করে কিন্তু তার বিষয়বস্তুর কোন খবর রাখে না এবং তাতে তার কোন উপকারও হয় না। ইহুদী-দের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্য তওরাতকে বহন করে এবং এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জাঁকজমক ও প্রতিপত্তি লাভ করতে চায় কিন্তু এর দিক নির্দেশ দ্বারা কোন উপকার লাভ করে না।

তফসীরবিদগণ বলেনঃ যে আলিম তার ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে না, তার দৃষ্টান্তও ইহুদীদের দৃষ্টান্তের অনুরূপ।

نہ محقق بود نہ دانشمند
چار پائے بر و کتابے چند

আমলহীন আলিম চিন্তাবিদ ও সুধীজন কোনটাই নয়—সে কয়েকটি কিতাব বহনকারী চতুষ্পদ জন্তু মাত্র।

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

ইহুদীরা তাদের কুফর, শিরক ও চরিত্রহীনতা সত্ত্বেও দাবী করত যে, نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ অর্থাৎ আমরা তো আল্লাহ্‌র সন্তান-সন্ততি ও প্রিয়জন। তারা নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে জান্নাতের যোগ্য অধিকারী মনে করত না বরং তাদের বক্তব্য ছিলঃ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا—অর্থাৎ ইহুদী না হয়ে কেউ জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না। তারা যেন নিজেদেরকে পরকালের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করত এবং জান্নাতের নিয়ামতসমূহকে তাদের ব্যক্তিগত জায়গীর মনে করত। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, পরকালের নিয়ামতসমূহ ইহকালের নিয়ামত অপেক্ষা হাজারো গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সে আরও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরই সে এসব মহান ও চিরন্তন নিয়ামত অবশ্যই লাভ করবে, তার মধ্যে সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধি থাকলে সে অবশ্যই মনেপ্রাণে মৃত্যু কামনা করবে। তার আন্তরিক বাসনা হবে যে, মৃত্যু শীঘ্র আসুক, যাতে সে দুনিয়ার মলিন ও দুঃখ-বিষাদে পূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে অকৃত্রিম সুখ ও শান্তির চিরকালীন জীবনে প্রবেশ করতে পারে।

তাই আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছেঃ আপনি ইহুদীদেরকে বলুন, যদি তোমরা দাবী কর যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একমাত্র তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু ও প্রিয়পাত্র এবং পরকালের আযাব সম্পর্কে তোমরা মোটেই কোন আশংকা না কর, তবে জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী এই যে, তোমরা মৃত্যু কামনা কর এবং মৃত্যুর জন্য আগ্রহান্বিত থাক।

এরপর কোরআন নিজেই বলেঃ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

অর্থাৎ তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ, তারা পরকালের জন্য কুফর, শিরক ও কুকর্ম ব্যতীত আর কিছুই পায়নি। অতএব তারা ভালরূপে জানে যে, পরকালে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিই অবধারিত রয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র প্রিয়জন হওয়ার যে দাবী করে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা স্বয়ং তাদের অজানা নেই। তবে দুনিয়ার উপকারিতা লাভ করার জন্য তারা এ ধরনের দাবী করে। তারা আরও জানে যে, যদি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কথায় তারা মৃত্যু কামনা করে, তবে তা অবশ্যই কবূল হবে এবং তারা মরে যাবে। তাই বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা মৃত্যু কামনা করতেই পারে না।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যদি এক্ষণে তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করত, তবে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হত।—(রূহুল-মা'আনী)

মৃত্যু কামনা জায়েয কি না ঃ সূরা বাক্কারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ এই যে, দুনিয়াতে কারও এরূপ বিশ্বাস করার অধিকার নেই যে, সে মৃত্যুর পর অবশ্যই জান্নাতে যাবে এবং কোন প্রকার শাস্তির আশংকা নেই। এমতাবস্থায় মৃত্যু কামনা করা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করারই নামান্তর।

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ— অর্থাৎ ইহুদীরা উপরোক্ত দাবী সত্ত্বেও মৃত্যু কামনা থেকে বিরত থাকত। এর সারমর্ম মৃত্যু থেকে পলায়ন করা বৈ নয়। অতএব আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর, তা অবশ্যই আসবে। আজ নয় তো কিছুদিন পর। সুতরাং মৃত্যু থেকে পলায়ন সম্পূর্ণত কারও সাধ্যে নেই।

মৃত্যুর কারণাদি থেকে পলায়নের বিধান ঃ যেসব বিষয় স্বভাবত মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে, সেগুলো থেকে পলায়ন জ্ঞান-বুদ্ধি ও শরীয়তের পরিপন্থী নয়। একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি কাত হয়ে পড়া প্রাচীরের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুত চলে যান। কোথাও অগ্নি-কাণ্ড সংঘটিত হলে সেখান থেকে পলায়ন না করা বিবেক ও শরীয়ত উভয়ের পরিপন্থী। কিন্তু আয়াতে যে মৃত্যু থেকে পলায়নের নিন্দা করা হয়েছে, এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকে এবং জানে যে, মৃত্যুর সময় এলে তা থেকে পলায়ন নিষ্ফল। যেহেতু তার জানা নেই যে, এই অগ্নি অথবা বিষ অথবা অন্য কোন মারাত্মক বস্তুর মধ্যে নির্দিষ্টভাবে তার মৃত্যু লিখিত আছে কি না, তাই এ থেকে পলায়ন মৃত্যু থেকে পলায়ন নয়, যার নিন্দা করা হয়েছে।

কোন জনপদে প্লেগ অথবা মহামারী দেখা দিলে সেখান থেকে পলায়ন করা জায়েয কিনা, এটা একটা স্বতন্ত্র মাস'আলা। ফিকহ্ ও হাদীসগ্রন্থে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। তফসীরে রূহুল মা'আনীতে এই আয়াতের তফসীরেও এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তা উদ্ধৃত করার অবকাশ নেই।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى

ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

(৯) হে মু'মিনগণ ! জুমু'আর দিনে যখন নামাযের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (১০) অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। (১১) তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বলুন ঃ আল্লাহ্র কাছে যা আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, জুমু'আর দিনে যখন (জুমু'আর) নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের (অর্থাৎ নামায ও খোতবার) পানে ত্বরা করে চল এবং বেচাকেনা (এমনিভাবে প্রতিবন্ধক কর্মব্যস্ততা) বন্ধ কর। (অধিক গুরুত্বদানের জন্য বিশেষভাবে বেচাকেনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বেচাকেনা বর্জন করাকে উপকার বর্জন করা মনে করা হয়)। এটা (অর্থাৎ বেচাকেনা ও কর্মব্যস্ততা ত্যাগ করে নামাযের দিকে ত্বরা করা) তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (কেননা, এর উপকারিতা চিরস্থায়ী এবং বেচাকেনা ইত্যাদির উপকারিতা ক্ষণস্থায়ী)। অতঃপর (জুমু'আর) নামায সমাপ্ত হয়ে গেলে (ইস-লামের প্রথমদিকে খোতবা পরে পাঠ করা হত। এমতাবস্থায় নামায সমাপ্ত হওয়ার অর্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসহ সমাপ্ত হওয়া অর্থাৎ নামায ও খোতবা উভয়ই সমাপ্ত হওয়া, তখন তোমাদের জন্য অনুমতি আছে যে) তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর (অর্থাৎ তখন পার্থিব কাজকর্মের জন্য হাটে-বাজারে ছড়িয়ে পড়ার অনুমতি আছে) এবং (এ সময়েও) আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ কর (অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ ও জরুরী ইবাদত থেকে গাফিল হয়ে পার্থিব কাজকর্মে মশগুল হয়ো না) যাতে তোমরা সফলকাম হও। (কারও কারও অবস্থা এই যে) তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়া-কৌতুক দেখে, তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তৎপ্রতি ছুটে যায়। বলুন ঃ আল্লাহ্র কাছে যা (অর্থাৎ

সওয়াব ও নৈকট্য) আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (যদি তা থেকে রিযিক বৃদ্ধির লালসা থাকে, তবে বুঝে নাও যে) আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিযিকদাতা। (তাঁর জরুরী ইবাদতে মশগুল থাকলে তিনি নির্ধারিত রিযিক দান করেন । এমতাবস্থায় তাঁর আদেশ কেন বর্জন করা হবে ?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ - يَوْمِ الْجُمُعَةِ এই দিনটি মুসলমানদের সমাবেশের দিন। তাই এই দিনকে 'ইয়াওমুল জুমু'আ' বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও সমস্ত জগতকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। এই ছয়দিনের শেষ দিন ছিল জুমু'আর দিন। এই দিনেই আদম (আ) সৃজিত হন, এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করা হয় এবং এই দিনেই জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়। কিয়ামত এই দিনেই সংঘটিত হবে। এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে, যাতে মানুষ যে দোয়াই করে, তাই কবূল হয়। এসব বিষয় সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে।---(ইবনে কাসীর)

আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি সপ্তাহে মানবজাতির সমাবেশ ও ঈদের জন্য এই দিন রেখে-ছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতরা তা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ইহুদীরা 'ইয়াওমুস সাব্ত' তথা শনিবারকে নিজেদের সমাবেশের দিন নির্ধারিত করে নেয় এবং খৃস্টানরা রবিবারকে। আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকেই তওফীক দিয়েছেন যে, তারা শুক্রবারকে মনোনীত করেছে। ---(ইবনে কাসীর) মূর্খতা যুগে শুক্রবারকে 'ইয়াওমে আরূবা' বলা হত। আরবে কা'ব ইবনে লুঈ সর্বপ্রথম এর নাম 'ইয়াওমুল জুমু'আ' রাখেন। এই দিনে কোরায়েশদের সমাবেশ হত এবং কা'ব ইবনে লুঈ ভাষণ দিতেন। এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পাঁচশ ষাট বছর পূর্বের ঘটনা।

কা'ব ইবনে লুঈ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্বপুরুষদের অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলা মূর্খতা যুগেও তাকে প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা করেন এবং একত্ববাদের তওফীক দান করেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের সুসংবাদও মানুষকে শুনিয়েছিলেন। কোরায়েশ গোত্র তাঁকে একজন মহান ব্যক্তি হিসাবে সম্মান করত। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা) নবুয়ত লাভের পাঁচশ ষাট বছর পূর্বে যেদিন তার মৃত্যু হয়, সেদিন থেকেই কোরায়েশরা তাদের বছর গণনা শুরু করে। শুরুতে কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন থেকে আরবদের বছর গণনা আরম্ভ করা হত। কা'ব ইবনে লুঈ-এর মৃত্যুর পর তার মৃত্যুদিবস থেকেই বছর গণনা প্রচলিত হয়ে যায়। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের বছর যখন হস্তিবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন এদিন থেকেই তারিখ গণনা আরম্ভ হয়। সারকথা এই যে, ইসলাম পূর্বকালেও কা'ব ইবনে

লুঈ-এর আমলে শুক্রবার দিনকে গুরুত্ব দান করা হত। তিনিই এই দিনের নাম জুমু'আর দিন রেখেছিলেন।---(মাযহারী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে মদীনার আনসারগণ হিজরত ও জুমু'আর নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই স্বকীয় মতামতের মাধ্যমে জুমু'আর দিনে সমাবেশ ও ইবাদতের ব্যবস্থা করত।---(মাযহারী)

نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ—نداء صلوة বলে আযান বোঝানো হয়েছে। سعى শব্দের এক অর্থ দৌড়া এবং অপর অর্থ কোন কাজ গুরুত্ব সহকারে করা। এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। কারণ, নামাযের জন্য দৌড়ে আসতে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ শান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে নামাযের জন্য গমন কর। আয়াতের অর্থ এই যে, জুমু'আর দিনে জুমু'আর আযান দেওয়া হলে আল্লাহ্র রিযিকের দিকে ত্বরা কর। অর্থাৎ নামায ও খোতবার জন্য মসজিদে যেতে যত্নবান হও। যে ব্যক্তি দৌড় দেয়, সে অন্য কোন কাজের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তোমরাও তেমনি আযানের পর নামায ও খোতবা ব্যতীত অন্য কাজের দিকে মনোযোগ দিও না।---(ইবনে কাসীর) ذكر الله বলে জুমু'আর নামায এবং এই নামাযের অন্যতম শর্ত খোতবাও বোঝানো হয়েছে।---(মাযহারী)

وَذَرُوا الْبَيْعَ—অর্থাৎ বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এতে বোঝা যায় যে, জুমু'আর আযানের পর বেচাকেনা হারাম করা হয়েছে। এই আদেশ পালন করা বিক্রেতা ও ক্রেতা সবার উপর ফরয। বলা বাহুল্য, দোকানপাট বন্ধ করে দিলেই ক্রয়-বিক্রয় আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্যঃ জুমু'আর আযানের পর কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমসহ সকল কর্মব্যস্ততা নিষিদ্ধ করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কোরআন পাক কেবল বেচাকেনার কথা উল্লেখ করেছেন। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ছোট ও বড় শহরের অধিবাসীদেরকে জুমু'আর নামায পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ছোট ছোট গ্রাম ও অনাবাদ জায়গায় জুমু'আ হবে না। তাই শহরবাসীদের সাধারণ কর্মব্যস্ততা ও বেচাকেনাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফিকহ্বিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে বেচাকেনা বলে এমন প্রত্যেক কাজ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা জুমু'আর নামাযে গমনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অতএব আযানের পর পানাহার করা, নিদ্রা যাওয়া, কারও সাথে কথা বলা, অধ্যয়ন করা ইত্যাদি সব নিষিদ্ধ। কেবল জুমু'আর প্রস্তুতি সম্পর্কিত কাজকর্ম করা যেতে পারে।

শুরুতে জুমু'আর আযান একটি ছিল, যা খোতবার পূর্বে ইমামের সামনে দাঁড়িয়ে দেওয়া হত। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা)-এর আমল পর্যন্ত এই পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। হযরত ওসমান (রা)-এর আমলে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেল এবং মদীনার চতুষ্পার্শ্বে ছড়িয়ে পড়ল তখন সেই আযান দূর পর্যন্ত শুনা যেত না। তখন হযরত ওসমান

(রা) মসজিদের বাইরে নিজ বাসগৃহ যাওরায় আরও একটি আযানের ব্যবস্থা করলেন। এই আযান সমগ্র মদীনা শহরে শুনা যেত। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ এই নতুন ব্যবস্থায় আপত্তি করেন নি। ফলে এই প্রথম আযান সাহাবায়ে কিরামের ইজমা দ্বারা সিদ্ধ হয়ে গেল। আযানের পর বেচাকেনা ও অন্যান্য কর্মব্যস্ততা নিষিদ্ধ হওয়ার যে আদেশ খোতবার আযানের পর কার্যকর ছিল, তা এখন থেকে প্রথম আযানের পরই কার্যকর হয়ে গেল। হাদীস, তফসীর ও ফিকহ্‌র কিতাবাদিতে এসব বিষয় কোন প্রকার মতবিরোধ ছাড়াই 'বর্ণিত আছে।

সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, জুমু'আর দিন যোহরের পরিবর্তে জুমু'আর নামায ফরয। তারা এ ব্যাপারেও একমত যে, জুমু'আর নামায সাধারণত পাঞ্জেগানা নামাযের মত নয়, এর জন্য কিছু অতিরিক্ত শর্ত রয়েছে। পাঞ্জেগানা নামায একাকী জমা'আত ছাড়াও পড়া যায় এবং দুইজনেও পড়া যায়, কিন্তু জুমু'আর নামায জামা'আত ব্যতীত আদায় হয় না। জামা'আতের সংখ্যায় ফিকহ্‌বিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। এমনিভাবে পাঞ্জেগানা নামায নদী, পাহাড়, জঙ্গল সর্বত্র আদায় হয়, কিন্তু জুমু'আর নামায এসব জায়গায় কারও মতে আদায় হয় না। নারী, রোগী ও মুসাফিরের উপর জুমু'আর নামায ফরয নয়। তারা জুমু'আর পরিবর্তে যোহর পড়বে। কি ধরনের জনপদে জুমু'আ ফরয, এ সম্পর্কে ইমামগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। ইমাম শাফেয়ী (র)-র মতে যে জনপদে চল্লিশ জন মুক্ত, বুদ্ধিমান ও প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ বাস করে, সেখানে জুমু'আ হতে পারে। এর কম হলে জুমু'আ হবে না। ইমাম মালেক (র)-এর মতে জুমু'আর জন্য এমন জনপদ জরুরী, যার গৃহ সংলগ্ন এবং যাতে বাজারও আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র মতে জুমু'আর জন্য ছোট বড় শহর অথবা বড় গ্রাম হওয়া শর্ত, যাতে অলিগলি ও বাজার আছে এবং পারস্পরিক ব্যাপারাদি মীমাংসা করার জন্য কোন বিচারক আছে।

সারকথা এই যে, উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে উম্মতের অধিকাংশ আলিম একমত যে, সর্বাবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের উপর জুমু'আ ফরয নয়; বরং সবার মতে কিছু কিছু শর্ত আছে। শর্তগুলো কি কি, কেবল সে ব্যাপারেই মতবিরোধ আছে। তবে যাদের উপর ফরয, তাদের উপর গুরুত্ব ও তাকীদ সহকারেই ফরয। তাদের মধ্যে কেউ শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতিরেকে জুমু'আ ছেড়ে দিলে তার জন্য সহীহ্ হাদীসসমূহে কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শর্তাদি সহকারে জুমু'আর নামায আদায় করে, তাদের জন্য বিশেষ ফযীলত ও বরকতের ওয়াদা আছে।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ পূর্বের আয়াতসমূহে জুমু'আর আযানের পর বেচাকেনা ইত্যাদি পার্থিব কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই আয়াতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, জুমু'আর নামায সমাপ্ত হলে ব্যবসায়িক কাজকর্ম এবং রিযিক হাসিলের চেষ্টা সবাই করতে পারে।

জুমু'আর পরে ব্যবসায়ে বরকত ঃ হযরত এরাফ ইবনে মালেক (র) যখন জুমু'আর নামাযান্তে বাইরে আসতেন তখন মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيْضَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا اَمَرْتَنِىْ فَارْزُقْنِىْ مِنْ فَضْلِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ -

হে আল্লাহ্! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি, তোমার ফরয নামায পড়েছি এবং তোমার আদেশ মত নামাযান্তে বাইরে যাচ্ছি। অতএব তুমি স্বীয় কৃপায় আমাকে রিযিক দান কর। তুমি উত্তম রিযিকদাতা।---(ইবনে কাসীর)

কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমু'আর পরে ব্যবসায়িক কাজ-কারবার করে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সত্তরবার বরকত নাযিল করেন। ---(ইবনে কাসীর)

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا نِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ۝

এই আয়াতে তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যারা জুমু'আর খোতবা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়িক কাজ-কারবারে মনোযোগ দিয়েছিল। ইবনে কাসীর বলেন: এই ঘটনা তখনকার, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) জুমু'আর নামাযের পর জুমু'আর খোতবা পাঠ করতেন। দুই ঈদের নামাযে অদ্যাবধি এই নিয়ম প্রচলিত আছে। এক জুমু'আর দিনে রসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযান্তে খোতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনার বাজারে উপস্থিত হয় এবং ঢোল ইত্যাদি পিটিয়ে তা ঘোষণা করা হয়। ফলে অনেক মুসল্লী খোতবা ছেড়ে বাজারে চলে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বল্পসংখ্যক সাহাবীসহ মসজিদে থেকে যান। তাদের সংখ্যা বারজন বর্ণিত আছে।---(আবূ দাউদ) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন: যদি তোমরা সবাই চলে যেতে, তবে মদীনার উপত্যকা আযাবের অগ্নিতে পূর্ণ হয়ে যেত---(ইবনে কাসীর)

তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন, এই বাণিজ্যিক কাফেলাটি ছিল দেহ্ইয়া ইবনে খলফ্ কলবীর। সে সিরিয়া থেকে মাল-সম্ভার নিয়ে এসেছিল। তার কাফেলায় সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছু থাকত। তার আগমনের সংবাদ পেলে মদীনার নারী-পুরুষ সবাই দৌড়ে কাফেলার কাছে যেত। দেহ্ইয়া ইবনে খলফ্ তখন পর্যন্ত মুসলমান ছিল না; পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হাসান বসরী ও আবূ মালেক (র) বলেন: এই কাফেলার আগমনের সময় মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল।---(মাযহারী) এসব কারণেই বিপুলসংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম বাণিজ্যিক কাফেলার আওয়ায শুনে মসজিদ থেকে বের হয়ে যান। ফরয নামায শেষ হয়ে গিয়েছিল। খোতবা সম্পর্কে তাঁদের জানা ছিল না যে, এটাও ফরয। দ্বিতীয়ত

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য এবং তৃতীয়ত বাণিজ্যিক কাফেলার উপর সবার ঝাঁপিয়ে পড়া----এসব কারণে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, দেরীতে গেলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যাবে না।

এসব কারণেই সাহাবায়ে কিরামের পদস্খলন হয় এবং উল্লিখিত হাদীসে তাঁদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়। এ ব্যাপারে তাঁদেরকে লজ্জা দেওয়া ও হুঁশিয়ার করার জন্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) নিয়ম পরিবর্তন করে জুমু'আর নামাযের পূর্বে খোতবা দেওয়া শুরু করেন। বর্তমানে তাই সুন্নত।--(ইবনে কাসীর)

আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একথা বলে দিতে আদেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র কাছে যে সওয়াব আছে, তা এই বাণিজ্য থেকে উত্তম। এটাও অবান্তর নয় যে, যারা নামায ও খোতবার খাতিরে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেয়, তাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দুনিয়াতেও বিশেষ বরকত নাযিল হবে, যেমন পূর্বে এমনি এক রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।